নাম: মো: রানা তালুকদার

জন্ম তারিখ: ৩ মে, ১৯৯২

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ড্রাইভার এবং কন্ট্রাক্টর (মেকানিক্যাল এবং ম্যানুয়াল),
শাহাদাতের স্থান: উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

শহীদের জীবনী

"এক স্বপ্নবাজ পিতার ছিন্ন হৃদয়
আর বিদ্রোহী আত্মার নাম"

একটি নাম, একটি সময়, একটি গল্প,রানা তালুকদার।জন্ম ১৯৯২ সালের ৩ মে, উত্তরা আজমপুরের এক মধ্যবিত্ত ঘরে।বাবার নাম মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মায়ের নাম রুবি তালুকদার।একটি সাধারণ পরিবার, কিন্তু এই 'সাধারণ' শব্দটির আড়ালে লুকিয়ে ছিল অসাধারণ এক মনুষ্যত্বের দীপ্তি।মৃত্যুর সময় বয়স ছিল মাত্র ৩২।একটি দেশের জন্য যুবার বয়স, বিপ্লবের বয়স।পেশায় ছিলেন গাড়িচালক ও কন্ট্রাক্টর, শহরের ক্লান্ত রাস্তাগুলোর নীরব সাক্ষী; কিন্তু পরিচয়ে ছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশি একজন অমায়িক মানুষ, স্বপ্নবাজ পিতা, প্রতিবেশীদের ভরসার ঠিকানা, এবং এক কাঁপতে থাকা দেশে পরিবর্তনের এক সাহসী পদধ্বনি।

তাঁর জীবন ছিল সাদামাটা, কিন্তু অন্তরের ভিতর এক অদম্য আগুন লুকিয়ে ছিল।স্ত্রী রানু আর একমাত্র তিন বছরের ছোট ছেলেটিকে নিয়ে ছিল তাঁর সংসার। এই ছোট সংসারই ছিল তার সবটা, আর সেই ছোট ছেলের জন্যই তার হৃদয়ে জ্বলে উঠেছিল এক আলোকিত স্বপ্ন "হাফেজ বানাবো আমার ছেলেটারে।' এই স্বপ্নই ছিল তাঁর দুনিয়ার সেরা প্রকল্প।দিনে শ্রমিকের মতো ঘাম ঝরাতেন, রাতে বাবার মতো মাথা চুলকাতেন, কিন্তু মাথা নত করতেন না কখনো।

রানা ছিলেন প্রতিবেশীদের কাছে একজন "মানুষ" আধুনিক শহরে যেটি বিলুপ্তপ্রায় একটি শব্দ।কারো ঘরে চিকিৎসার দরকার? রানা আসবে।কারো ছেলে বখে গেছে? রানা বুঝাবে।একা মা ছেলের জন্য কাঁদছে? রানা পাশে দাঁড়াবে।শহর যেখানে নিঃস্বার্থতা ভুলে গিয়েছে, সেখানে রানা ছিল সেই পুরনো যুগের এক মানবিক দীপ্তি নতুন সময়ের চোখে সেকেলে, কিন্তু বিপ্লবের ভাষায় অনন্ত।

তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পরিচয় এসেছে মৃত্যুর পর শহীদ।কিন্তু এই শব্দের পেছনে লুকিয়ে আছে যে মনুষ্যত্ব, যে নীরব সাহস, যে অসমাপ্ত স্বপ্ন, তা কোনো তালিকা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না।২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে তিনি ছিলেন না কোনো নেতার তালিকায়, কোনো পোস্টারেও তার ছবি ছিল না।কিন্তু বিপ্লবের মূল হৃদয়টা তো এইরকম মানুষদের দিয়েই গড়ে ওঠে।রাজপথে যে রক্ত ঝরে, তা অনেক সময় কোনো ব্যাজধারী নেতার নয়, বরং রানার মতো নীরব যোদ্ধাদের।

তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে, ন্যায় বিচারের পক্ষে, ভবিষ্যতের সন্তানের নিরাপত্তার জন্য।তিনি নামাজ পড়ে রাস্তায় নেমেছিলেন, হাতে অস্ত্র ছিল না, কিন্তু চোখে ছিল আগুন।নিজের কথা না ভেবে ভগ্নিপতির চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন, "ভাইদেরকে গুলি করে মারছে, আমি একটু দেখে আসি।' সেই 'দেখে আসা'-ই ছিল ইতিহাসের দিকে এক চূড়ান্ত পদক্ষেপ।

শহীদ রানা তালুকদার আমাদের স্মৃতিতে থেকে যাবেন একজন অশ্রুসজল পিতা, একজন নির্ভীক প্রতিবাদী, এবং একজন স্বপ্নবান নাগরিক হিসেবে।তিনি প্রমাণ করে গেছেন, বিপ্লবের সোনালি মানচিত্র আঁকে কেবল তারাই, যারা জীবনের ভেতরেই মৃত্যু বয়ে নিয়ে হাঁটে, যারা সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য নিজের বর্তমান উৎসর্গ করে দেয়।রানার নাম আমরা ভুলবো না, ভুলতে পারবো না, কারণ সে-ই আমাদের সময়ের মুখপাত্র একজন নীরব শহীদ, যার রক্তে রাঙা হয়েছে ইতিহাসের রাজপথ।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট : আগুনের জুলাই ও রানার পদধ্বনি

২০২৪ সালের জুলাই মাস, ঢাকার আকাশ তখন আর নীল ছিল না ছিল ধূসর, গুমোট, এবং প্রতিদিন গুলির শব্দে ভাঙা।বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল শুধু বারুদের ঘ্রাণে নয়, মানুষের ভিতরের ক্ষোভ, দীর্ঘবছরের শোষণ, অবহেলা আর প্রতারণার এক অগ্নিঝরা প্রতিক্রিয়ায়।যেন পুরো শহর জেগে উঠেছিল এক দীর্ঘ নিঃশ্বাসের পর একটা গোঙানি, যা যুগের পর যুগ ধীরে ধীরে জমে গিয়েছিল এই দেশের মাটিতে।

পুলিশের রাবার বুলেট, টিয়ার গ্যাস, প্রহসনের মতো সাজানো নির্বাচনের ফলাফল সবকিছু মিলিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল এক নতুন প্রজন্ম।ওরা আর ভয় পেত না, কারো দয়ার প্রার্থী ছিল না, আর ওদের চোখে ছিল একরাশ আঘাত, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল প্রত্যয়।"তুমি কে, আমি কে? রাজাকার রাজাকার!" এই তীব্র ধ্বনি যেন শহরের প্রতিটি দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা মারত, রক্তাক্ত করে তুলত পাথরের মতন বিবেকহীন শাসকদের।

এই স্লোগান শুধু আওয়াজ ছিল না, ছিল আত্মার ক্রন্দন, ইতিহাসের পুঞ্জীভূত রাগ।আর সেই রাগকে হৃৎপিণ্ডে ধারণ করে রাস্তায় নেমেছিলেন রানা তালুকদার গাড়িচালক, কন্ট্রাক্টর, একজন পিতা, একজন প্রতিবেশী, কিন্তু তার চেয়েও বড় পরিচয় একজন নীরব বিপ্লবী।রাজনীতির ফটোফ্রেমে তার ছবি ছিল না, কিন্তু রাস্তায় তার পায়ের ধ্বনি ছিল ইতিহাসের তাণ্ডব।

তিনি রাস্তায় নেমেছিলেন ধর্মের টানে নয়, দলে টানে নয়, বরং নেমেছিলেন হৃদয়ের ডাকে।মাগরিবের নামাজের পর তিনি যখন আবারো বেরিয়ে গেলেন, সেটা ছিল আত্মার এক নীরব আহ্বানে সাড়া দেওয়া।বাড়িতে ছোট ছেলে আর অসুস্থ স্ত্রী রেখে তিনি যাননি শুধু দেখতে কী হচ্ছে তিনি গিয়েছিলেন যেন শেষ পংক্তিটা জুড়ে দিতে, ইতিহাসের বইতে যা ছিঁড়ে যাওয়ার পথে ছিল।

"দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেব রক্ত!" এই মন্ত্র যেন তার প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।বুকে গর্জে উঠছিল প্রতিবাদের আগুন, হাতে ছিল না অস্ত্র, কিন্তু সাহস ছিল আগ্নেয়গিরির চেয়েও বেশি।ওরকম সাহসই তো ইতিহাস বদলায়।

সৌজন্যে: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

রানা ছিলেন সেইসব মানুষের প্রতিনিধি, যাদের নাম রাষ্ট্রের খাতায় ওঠে না, কিন্তু মাটির খাতায় লেখা থাকে রক্তচিহ্নে।তার আত্মত্যাগ সেই বার্তা দিল, যা শুধু একটি শহরের নয়,একটি জাতির চেতনা।"রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়",এই চূড়ান্ত হুঙ্কারে, ইতিহাস জানিয়ে দিল, অন্যায় আর নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে না।

এই আন্দোলনের শক্তি ছিল রানা তালুকদারের মতো মানুষদের নিঃশব্দ প্রতিরোধে, তাঁদের চোখের ভাষায়, তাঁদের জীবনবোধে।রাজনীতির গলিতে নাম না থাকলেও ইতিহাসের রাজপথে তাঁদের জন্য থাকবে এক অমোচনীয় স্থান।রানার পদধ্বনি মিশে গেছে সেই গুলির শব্দের সাথে, কিন্তু তার চেয়ে জোরে বাজছে তার সংকল্প,একটি ন্যায্য, মর্যাদাবান ভবিষ্যতের জন্য যে যুদ্ধে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।

এটাই ছিল জুলাই বিপ্লব,শুধু একটি তারিখ নয়, এক দুঃসহ ঋতু, এক বজ্রনির্ঘোষ যে বলে গেছে: "আমরা ভয় পাই না আর।আমরা জেগে উঠেছি।'

শহীদ হওয়ার কাহিনি: একটি মা ও একটি জাতির রক্তাক্ত প্রার্থনা

৫ জুলাই, ২০২৪।ঢাকার বাতাসে তখন শুধু বারুদের ঘ্রাণ নয়,ছিল অজস্র অশ্রুর স্রোত, মায়ের হাহাকার, সন্তানের আর্তনাদ।দিনটি শুরু হয়েছিল খুব সাধারণভাবে, খুব গরিবের মতো,যেমন রোজ শুরু হতো রানার পরিবারে।সেদিন বিকেলে ঘরে ঢুকে মা হাতে করে ভাত নিয়ে এলেন।তার বউ বলল, "মা ভাত এনেছে, একসাথে খাবো।' রানার তিন বছরের ছেলেটা খুশিতে লাফাচ্ছিল।এ যেন যুদ্ধের আগের একটুকরো শান্তির সন্ধ্যা।

ভাত খাওয়া শেষে রানা তার ছেলেকে ঘুম পাড়ালেন।বাইরে তখন টিভিতে আন্দোলনের খবর চলছিল,সেই আগুনঝরা প্রতিবাদ, যে আন্দোলন তার আত্মার গভীরে দোলা দিয়েছিল বহু আগে থেকেই।খবর দেখতে দেখতে আসরের আজান পড়ল।রানা শান্তভাষায় বলল, "আমি নামাজ পড়ে আসি।' কেউ ভাবতেও পারেনি,এই হবে তার শেষ নামাজ।

নামাজ শেষে সে আর ঘরে ফিরেনি।

রাত গড়িয়ে গেল।মাগরিবও হয়ে গেল।অথচ রানার কোনো খবর নেই।মা, স্ত্রী, বাড়ির সবাই তখন উৎকণ্ঠায় ছটফট করছে।ফোনে কোনো সাড়া নেই।রানার স্ত্রী তখন মা'কে কাঁপা গলায় বলল, "আম্মা, একটু দেখেন না, কোথায় গেলো? কল ধরতেছে না।খুব ভয় করছে..."

মা আর বড় বউ তখন রওনা দেন খুঁজতে।শহরের রাস্তা তখন একেকটা যেন মৃত্যুকূপ।আজিমপুর থানার পেছনে পৌঁছতেই গুলির তাণ্ডবে আর এগোতে পারেন না।থেমে যান, কিন্তু মা তো থামে না,হৃদয় থামে না সন্তানের খোঁজে।

সেখানে থেকে তিনি ফোন দেন বড় ছেলেকে।সে বলে, "আসছি।' সে এসে মাকে হাত ধরে বলে, "তুমি চলো, আমি ভাইকে নিয়ে আসবো।'

কিন্তু সেই ভাইকে আর ফেরানো গেল না।

পাঁচ মিনিটও পেরোল না, হঠাৎ গুলির শব্দ।দুই, তিন, একটার পর একটা,তারপর এক আর্তনাদ: "মা... রানা নাই।'

দৌড়ে যান মা।রক্তের ঢেউ গড়িয়ে পড়েছে রাস্তার গর্তে, ফুটপাথে, ইতিহাসের বুকে।রানার মাথার পেছনের অংশ নেই,ছিল না আশার কোনো আলো।তিনি একটা গামছা দিয়ে কোনোমতে রক্ত থামাতে চাইলেন, কিন্তু ততক্ষণে ছেলের শরীর ঠান্ডা, নিস্তব্ধ।

"রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়",এই বাক্যটা যেন সেই মুহূর্তে আকাশ চিরে উঠছিল, কিন্তু মা জানতেন না কীভাবে ফিরবেন ঘরে।কীভাবে চোখে তাকাবেন তার ছোট্ট নাতিটার দিকে,যে বাবার পা জড়িয়ে ঘুমাতো, এখন থেকে ঘুমাবে বাবার স্মৃতির কবরঘরে।

সেই রাতে শুধু এক রানা তালুকদার শহীদ হননি,শহীদ হয়েছিল এক বিপ্লবী হৃদয়ের নিঃশেষ ভালোবাসা।শহীদ হয়েছিল মায়ের নিঃস্ব জীবন।শহীদ হয়েছিল একটি জাতির দায়বদ্ধতা।

এ মৃত্যু শুধু এক প্রাণের নিভে যাওয়া নয়,এ মৃত্যু ইতিহাসে আগুন জ্বালানো এক অনলবর্ষী ঘা।

বর্তমান পারিবারিক অবস্থা ও স্বপ্নভঙ্গের করুণ সুর:

তাঁকে আর কখনো ফিরে পাওয়া যাবে না।রানা তালুকদার,একজন স্বামী, পিতা, সন্তান,এখন শুধুই এক নাম, এক ছবি, এক গুলিবিদ্ধ স্মৃতি।কিন্তু যে শূন্যতা তিনি রেখে গেছেন, তা কোনো ভাষায় পূর্ণ হবার নয়।তিনি রেখে গেছেন এক নিঃস্ব মা, এক মানসিকভাবে

ভেঙে-পড়া স্ত্রী, আর এক তিন বছরের শিশু,যে এখনো জানে না কেন তার বাবা হঠাৎ করে আর তাকে কোলে নেয় না, নামাজে নিয়ে যায় না, কেন প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার জন্য কিছু নিয়ে ঘরে ফেরে না।

ছেলেটিকে হাফেজ বানানোর স্বপ্ন ছিল রানার।খুব বড় কোনো আশা ছিল না তার,কেবল চেয়েছিল তার সন্তান কুরআনের আলোয় বড় হোক, মানুষের মতো মানুষ হোক, যেন জীবনটাকে সোজা করে চলতে পারে।সেই মানুষটি,যে প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগেই ছেলেকে কোলে নিয়ে মসজিদের দিকে হাঁটত, পাঞ্জাবির পকেটে ছোট তসবি, চোখে মায়া আর মনেপ্রাণে এক ইবাদতের আশ্বাস,আজ শুধুই রক্তমাখা স্মৃতি।

"সবাইকে সবসময় সহযোগিতা করত" বলে তার স্ত্রী এখনো।যাকে সে ভালোবেসেছিল জীবনের সমস্ত দুঃখ ছাপিয়ে, সেই নারী আজ রানার অভাবেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।তার মানসিক ভারসাম্য ছিলই না, কিন্তু রানার সাহচর্যে যেন একটু একটু করে শান্ত হয়ে উঠছিল সে।এখন আবার হারিয়ে গেছে সেই ছায়াটুকুও। রানার অনুপস্থিতি তার মনে যে গভীর শূন্যতা তৈরি করেছে, তা ব্যাখ্যা করা যায় না,শুধু দেখা যায় তার ছিন্ন ছিন্ন কথায়, নির্ভুল অনুপস্থিতিতে।

মা? রানার মা রুবি তালুকদার এখনো রাতে ঘুমাতে পারেন না।ছেলে ফিরবে,এই মিথ্যে আশায় জানালায় তাকিয়ে থাকেন, যেমন কেউ গভীর সাগরের পাড়ে বসে ঢেউয়ের শব্দ গোনে।তার বুকজুড়ে এখন শুধু প্রশ্ন,"কেন এমন হলো? কে এর দায় নেবে?" যে সন্তান প্রতিটি দিন উপার্জনের শেষে একটুখানি হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরত, সে এখন নিথর, কবরের গভীরে।

অর্থনৈতিক দুর্দশা যেন শুধু দারিদ্র্যর নাম নয়, যেন এক নিঃশেষ অভিশাপ,সংসার এখন রোজকার টানাপোড়েনে, ঘরে চাল নেই, মগজে স্বস্তি নেই।কোথাও নেই কোনো সাহায্যের হাত।তারা ছিলেন এক স্বপ্নবান পরিবার, ছোট্ট হলেও পরিপাটি।এখন তারা একেকজন যেন ভাঙা নৌকা, বিপ্লবের ঢেউয়ে ডুবে যাওয়া আত্মা।

তবু ইতিহাস চুপ থাকে না।

রানার রক্ত, তার বিসর্জন, তার নিঃশব্দ প্রতিবাদ আজ এক অমোচনীয় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে থেকে গেছে জাতির সামনে।

সে রক্ত বলে,এই মৃত্যু নিষ্ফল নয়।এই ত্যাগ ভুলে যাওয়া যাবে না।

আমরা যদি ভুলেও যাই, যদি নিস্তব্ধ হয়ে পড়ি শহীদের কথা থেকে,তবু তার তিন বছরের সন্তান একদিন জানবে।বাবার রক্ত কীভাবে ঢেকে দিয়েছিল এই পিচঢালা শহর।

আর তখন সে জিজ্ঞাসা করবেই,

"আমার বাবাকে কে মেরেছিল? আর তোমরা তখন কোথায় ছিলে?"

সৌজন্যে: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

এ প্রশ্নের উত্তর জাতিকে একদিন দিতেই হবে।

প্রস্তাবনা:

রানা তালুকদারের নামটি আজ যেন এক গর্জন, একটি জীবন্ত জ্বলন্ত স্মৃতি,যা আমাদের জাতির বুকের মধ্যে দগ্ধ রক্তের মতো এখনও ঝলমল করে।তাঁর মৃত্যু নিছক এক ব্যক্তি হারানো নয়, এটি একটি আদর্শের অবসান নয়, বরং একটি নতুন যজ্ঞের আহ্বান।রানা ছিলেন সেই সাহসী প্রাণ, যিনি নির্ভয়ে প্রতিবাদের শিখা জ্বালিয়েছিলেন, হাতে ছিলেন ন্যায়ের পতাকা, চোখে ছিল অদম্য অগ্নি।আজ তাঁর রেখে যাওয়া পরিবার শুধু বেদনার অন্ধকারে নয়, তারা দেশের সামনে এক বিশাল দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমত, রানা তালুকদারের স্ত্রী এবং শিশুর জন্য অবিলম্বে সরকারিভাবে স্থায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান করা উচিত।এই সহায়তা যেন কেবল করুণা নয়, বরং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এক স্বীকৃতি, যা শহীদের পরিবারের প্রতি ন্যায় ও সম্মানের পরিচায়ক।কারণ, রানা তালুকদারের ত্যাগ শুধু তাঁর পরিবার নয়, সমগ্র জাতির জন্য একটি বীরত্বের দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়ত, রানা তালুকদারের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি চালু করা জরুরি, যাতে তারা পিতার মত আদর্শ, সততা, এবং সাহস নিয়ে বড় হতে পারে।শিক্ষা হবে তাদের ভবিষ্যতের স্রোত,যা তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবে।

অবশেষে, রানা তালুকদারের নাম ও জীবনকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্মানিত করে তাঁদের পরিবারকে মানসিক ও সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে।তাদের পাশে দাঁড়ানো হবে আমাদের সমাজের বড় দায়িত্ব,যাতে তারা নিঃস্বার্থভাবে জীবন চালিয়ে যেতে পারে, আবার পিতার স্মৃতিকে বুকে ধারণ করে নতুন দিনের সূর্য ওঠাতে পারে।রানা তালুকদারের পরিবার কেবল শহীদ পরিবারের ছায়া নয়, তারা দেশের এক জীবন্ত প্রত্যাশা, এক বীরত্বের ইতিহাস।আজ তাদের পাশে দাঁড়ানো মানে আমাদের জাতির ন্যায়ের পথে অটল হওয়া।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম : রানা তালুকদার

জন্ম তারিখ : ০৩-০৫-১৯৯২

বয়স : ৩৩ বছর

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত

পিতার নাম : মোঃ সিরাজুল ইসলাম

মাতার নাম : রুবি তালুকদার

স্ত্রীর নাম : রানু

এনআইডি : ৮২৩ ৭৪৬ ৬২৫৮

বর্তমান ঠিকানা : বাড়ী: ২৫-বি, রোড: মধ্য আজমপুর, পুরবকৈর, পো: আজমপুর-১২৩০, দক্ষিনখান, উত্তরা আজমপুর, কাঁচাবাজার, জামতলা, ঢাকা

স্থায়ী ঠিকানা : উত্তরা আজমপুর, কাঁচাবাজার ডাইনের জামতলা, ঢাকা

হাসপাতালে ভর্তি : উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

কেস আইডি : ২১৬৩২১১/০০১; ২৫৩১৯

মৃত্যুর তারিখ : ০৫-০৮-২০২৪

মৃত্যুর সময় : রাত ৮:১০ চগ, ১৯:০০:০০

মৃত্যুর কারণ : বুলেট ইনজুরি ; ব্রট ডেড; অপরিবর্তনীয় কার্ডিও-রেসপিরেটরি ফেইলিউর

পেশা : ড্রাইভার এবং কন্ট্রাক্টর (মেকানিক্যাল এবং ম্যানুয়াল)

রক্তের গ্রুপ : বি+

ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর : ঞঘ০০৫২৩৪৫খ০০০০৪